OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 196 - 200
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 196 - 200
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘দ্রৌপদী’ : তিন কালের তিন স্বর

নন্দিতা সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: iamnandita1994@gmail.com
0009-0006-9909-3738

Received Date *20. 01. 2026*
Selection Date *10. 02. 2026*

Keyword
Originator of the position of women, sufferings, torture, santhal woman, protested, helplessness, complexity of family structure.

Abstract
Draupadi of the Mahabharata was a unique protesting character. Unfortunately, she had to endure insults and torture at every step. Draupadi became the originator of the position of women in the middle age. From her own swayamvar assembly to every step of her life she was insulted. Her story of sufferings is known to all. The character of Draupadi through the changes of the era has been presented in different forms through the pens of different writers. The twentieth century story tellers Mahashweta Devi and Joya Mitra brought the changed form of Draupadi's immense physical torture to the fore at the time of Dussashan's attempt to disrobe Draupadi in the assembly and her eager prayer to krishna is heard. In the hands of Mahashweta Devi Draupadi has been portrayed as a santhal woman or the representative of the tribal sect. Despite her affliction, she herself protested against the injustice. Distinguished story teller Joya Mitra again tried to portray the mental helplessness and family politics of the Mahabharata's Draupadi in her story. She has highlighted how women are suppressed due to complexity of family structure and society even now. Our topic of discussion is "Women in society behind Draupadi", in the context of three eras. We will go through the fundamental shift of the nature of torture and how the social position of Draupadi is emerged through the pens of the writers; Mahashweta Devi and Joya Mitra have changed significantly; we will focus on that aspect.

Discussion

‘নাহং বরয়ামি সুতম্’-এই দৃঢ় প্রতিবাদী স্বর স্বয়ম্বর সভায় যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, তিনি হলেন পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা পাঞ্চালী। বাংলা সাহিত্য জগতে দ্রৌপদী খুবই চর্চিত একটি চরিত্র। ব্যাসদেবের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত থেকে বর্তমান কাল ব্যাপী বহু সাহিত্যিকের কলমে দ্রৌপদী ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দ্রৌপদীর চরিত্র নীরিক্ষণ হয়েছে। পৌরাণিক দ্রৌপদীর যে চিত্র আমাদের কাছে অবগত, সেই চিত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। দেশ-কাল-সমাজের ভিত্তিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যাসদেব দ্রৌপদীকে যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন, মহাভারতের জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদক কাশীরাম দাসের হাতে কিন্তু দ্রৌপদী সেভাবে উপস্থাপিত নয়। কাশীরাম

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 196 - 200
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দাসের দ্রৌপদী সমকালের বাঙালী ঘরের মেয়ের অবয়বে গঠিত। সমাজ বাস্তবতার দিক থেকে দুই কালের কবি একটি নারী হৃদয়ের আর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন ভিন্ন দৃষ্টিতে। দ্রৌপদীর দুঃসহ, অসহায়, নির্যাতিত জীবন যেন প্রত্যেক কালের নারী নির্যাতনের সূচক। পৌরাণিক চরিত্র দ্রৌপদী আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যেও একটি 'মাইলস্টোন' রূপে দণ্ডায়মান। আমাদের আলোচিত বিষয় দ্রৌপদীর চরিত্র বিশ্লেষণ নয়, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এখনও সমাজের নারীরা কীভাবে দ্রৌপদীতে পরিণত হচ্ছে ও সেই নির্যাতনের চিত্র সময়ের সঙ্গে কীভাবে সাহিত্যিকদের হাতে নবরূপ লাভ করছে, তারই সম্যক ধারণা লাভ করা।

মহাভারতে দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। পাঞ্চাল রাজ যজ্ঞসেন ও আচার্য দ্রোণ ছিলেন বাল্যবন্ধু। কিন্তু ধীরে ধীরে দুজনেই পরস্পরের শত্রু হয়ে ওঠেন। দ্রুপদ নিজের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য এমন এক পুত্রলাভ যে দ্রোণকে বধ করতে পারবে। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে জন্ম হয় ধৃষ্টদ্যুম্নের। কিন্তু তাঁর সাথে আবির্ভূতা হন এক মহীয়সী নারী। যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়েছেন বলে তাঁর নাম হয় যাজ্ঞসেনী, পাঞ্চাল রাজার কন্যা বলে তাঁর নাম হয় পাঞ্চালী, কৃষ্ণাবর্ণা বলে নাম কৃষ্ণা, পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদের কন্যা বলে নাম হয় দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর আবির্ভাব কালেই দৈববাণীতে শোনা যায়–

> "এ কন্যার জন্মে হৈল ভার নিবারণে
> ইহা হইতে ক্ষত্র সব হইবে নিধনে।"[১]

একটি নারীর জন্মই হয় তাঁর পিতার শত্রুপক্ষ ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। দ্রুপদ কিন্তু এই ধংসের জন্য পুত্র সন্তানই প্রার্থনা করেছিলেন। নারীর হাতে একটি বংশের ধ্বংসসাধন ঘটবে তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ দ্রুপদও ভাবতে পারেননি। ফলে এই নিয়তির লিখনে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার প্রভৃতি তাঁর জীবনের সঙ্গীতে পরিণত হয়। দ্রৌপদীর প্রতিপদে নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা সকলেরই অবিদিত। দ্রুপদ তাঁর কন্যা সম্প্রদানের জন্য এক স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন। সেখানেও দ্রৌপদীকে কম অপমানিত হতে হয়নি। অর্জুনকে স্বয়ম্বর সভায় পতি হিসাবে নির্বাচন করলেও সভায় উপস্থিত সকলের কামুক দৃষ্টি থেকে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। অন্যদিকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে যাওয়া পঞ্চ পুত্রের চিন্তায় কুন্তী সময় অতিবাহিত করছিলেন ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের গৃহে। পুত্রদের কণ্ঠে সে হঠাৎ শুনতে পান - মা ভিক্ষা এনেছি। অজান্তেই এক নারীর মুখ থেকে নির্গত হয় এক নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের লিখন। কুন্তী সংগৃহীত ভিক্ষান্ন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার নির্দেশ দেন। পঞ্চপাণ্ডবের সকলেই দ্রৌপদীকে পেতে চেয়েছিলেন, তাই অজান্তে কুন্তী যে আদেশ দিয়েছিলেন তা মেনে নিতে কারোর মধ্যেই কোন আপত্তি দেখা যায় না। এমনকি দ্রৌপদীর মধ্যেও পঞ্চ স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদ দেখা যায় না। শুধুমাত্র মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য একজন নারী নিজের শরীরকে পঞ্চস্বামীর দ্বারা ভোগ হতে দিয়েছিলেন? এই সত্য মানতে পাঠক সমাজের সত্যিই বড় অস্বস্তি হয়। এখানেই শেষ নয়, পাশা খেলায় সব সম্পত্তি হারিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে শেষপর্যন্ত বাজি রেখেছিলেন। নারীর অস্তিত্ব কতটাই সামান্য যে সে সহজেই পাশা খেলার বাজির সামগ্রী হয়ে যায়। দ্রৌপদী চরিত্রের আর একটি করুণ দিক আমাদের ভাবায়। যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'দাসী' সম্বোধন করে তাঁর কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে এসে বস্ত্রহরণের চেষ্টা করেন, তখন দ্রৌপদী তাঁর সম্মান রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন। একজন নারীকে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য একজন পুরুষের উপরেই নির্ভর হতে হয়। দ্রৌপদীর মধ্যে নিজের সম্মান রক্ষার কোন প্রয়াস দেখাননি সেই যুগের কোন লেখক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহাভারতের পুরুষ লেখকগণ দ্রৌপদীকে কেবলই করুণা, ভীতি, অত্যাচারিত, নির্যাতিত নারীর সূচক রূপেই গড়ে তুলেছেন। তাঁর প্রতিবাদী সত্তা কোথাও যেন পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাকে কর্তব্য পরায়ণ, আদর্শ বধূ, পতিব্রতা রমণী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর মনের কুঠুরিতে যে চাপা হাহাকার জমে ছিল তা মহাভারতের কোন অনুবাদকের পুরুষ দৃষ্টিকোণে হয়ত সেইভাবে ধরা পড়েনি। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন লাভের পঁয়ত্রিশ বছর পর তাঁর মহাপ্রস্থানের সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন দ্রৌপদী। পাণ্ডবদের কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সামনের দিকে প্রস্থান করেছিলেন। দ্রৌপদীর এই করুণ পরিণতিই মধ্যযুগের নারীদের অবস্থানকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদক ছিলেন চন্দ্রাবতী। তাঁর রামায়ণে সীতার কষ্ট, দুঃখ, ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 196 - 200
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যা অন্য কোন অনুবাদকের চোখে ধরা দেয়নি। এক নারীর দৃষ্টিতে তা হয়ে উঠেছে ‘সীতায়ণ’। মহাভারতের মহিলা অনুবাদক থাকলে হয়তো দ্রৌপদীর চরিত্র এতটা অসহায়ভাবে গড়ে উঠত না।

মহাভারতের দ্রৌপদীর এই অসহায় রূপ বিশ শতকের প্রধান লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ (১৯৭৮) গল্পে অনুপস্থিত। মহাভারতের দ্রৌপদী এখানে বিচিত্র অনুষঙ্গে ব্যঞ্জনাবহ হয়ে উঠেছে। দ্রৌপদী এই গল্পে অনার্য সাঁওতাল উপজাতির প্রতিনিধি। গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি সূর্য শাহু ও তার ছেলেকে খুন করার অপরাধে দ্রৌপদী অর্থাৎ দোপ্‌দী মেঝেন ও তার স্বামী দুলন মাঝি ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ বলে চিহ্নিত হয়। পুলিশ তাদের ধরার জন্য খুঁজে বেরাচ্ছে। তবুও দ্রৌপদী ও দুলন নিজেদের সুকৌশলে আত্মগোপন করে রাখে। দ্রৌপদী ও তার স্বামী ছাড়া আরও অনেকেই ছিল পার্টি কর্মী। তাদের স্বজাতি দুখীরাম ঘড়ারীর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রশাসনের হাতে নিহত হয় তার স্বামী দুলন মাঝি। দুলনের পরেই টার্গেট হয় দোপ্‌দী মেঝেন। সাঁওতালদের দমন করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনের এই ভীতিপ্রদর্শন মূলক ব্যবস্থাতেও রাজনৈতিক আদর্শ থেকে সরে আসেনি দ্রৌপদী। সংগ্রামের পথে নিজের জীবনকে বাজি রেখে এগিয়ে চলে সে। তাকে ধরার জন্য পুরস্কারের অঙ্ক দিন দিন বাড়তে থাকে। দ্রৌপদী নিজের কাছে আরও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে ধরা পড়লেও কোনভাবে সে প্রশাসনের কাছে মাথা নত করবে না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই—

> “সন্ধ্যা ছ'টা সাতান্নতে দ্রৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেনডেড্ হয়।”[২]

সঙ্গে সঙ্গেই সাঁওতাল রমণীর শরীরী কামনায় উল্লসিত হয়ে ওঠে প্রশাসনিক নরপিশাচের দল। হুকুম দেন—

> “ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল।”[৩]

তারপরের ঘটনা পাঠ করার সময় আমাদের হৃদয় শুধু আতঙ্কিত হয়ে ওঠে না, সমগ্র সমাজে রক্ষকের আড়ালে থাকা পাশবিক রূপটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন মহাশ্বেতা দেবী। দ্রৌপদীর উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে অমানবিক যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণ। এরপর—

> “চাঁদ কিছু জ্যোৎস্না বমি করে ঘুমোতে যায়। থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করে চিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার ওপর সক্রিয় মাংসের পিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে ও নামে।”[৪]

এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা শুধু দ্রৌপদীর ওপর ঘটে যাওয়া পাশবিক অত্যাচারকে প্রত্যক্ষ করি না, সমাজে একাধিক ধর্ষিত নারীর বেদনা অনুভূত হয় দ্রৌপদীর চোখের জলের আড়ালে। ধর্ষণের পর দ্রৌপদীর ক্ষতচিহ্নযুক্ত উলঙ্গ শরীরকে ঢেকে দিতে বলে সেনানায়ক। তখন বিশ শতকের নারীর প্রতিভূ হয়ে ওঠে দ্রৌপদী। মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজের নগ্ন দেহকে টার্গেট হিসেবে অস্ত্র করে নেয় সে। বিবস্ত্র শরীর নিয়ে সে এগিয়ে যায়, এবং বলে—

> “কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?”[৫]

তার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে কেঁপে ওঠে সেনানায়কের পাশবিক হৃদয়। মহাহাভারতের দ্রৌপদী তাঁর বস্ত্রহরণের সময় নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য চিরসখা কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি তাকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের এক সাঁওতাল রমনীকে ধর্ষণের হাত থেকে কোন দৈবকৃপা রক্ষা করেনি। তাই আর প্রার্থনা নয়, ধর্ষিতা হয়েও নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে দ্রৌপদী। যে শরীরকে কিছু সময় পূর্বেই ভোগ করা হয়েছে, দিনের আলোয় সেই উলঙ্গ ক্ষত বিক্ষত শরীরের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ সেনানায়ক। বহুদিনের জমে থাকা অত্যাচারিত মূক নারীরা যেন ভাষা পায় মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদীর প্রতিবাদী স্বরের মধ্যে দিয়ে।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পের ঠিক দশ বছর পরে দ্রৌপদী চরিত্রের একটি ভিন্ন রূপ দেখা যায় জয়া মিত্রের ‘দ্রৌপদী’ (১৯৮৭) গল্পে। নারী মানেই সব মেনে নেওয়া, এই ধারণার পরিবর্তে জয়া মিত্র তাঁর গল্পে নারীদের পৌঁছে দিয়েছেন মনুষ্যত্বের শিখরে। তাঁর দ্রৌপদী গল্পে কোন দ্রৌপদী নামের চরিত্রের উল্লেখ নেই। দ্রৌপদী মানেই যে শুধু নির্যাতিত, অসহায় নারী মূর্তি- এই ভাবধারা থেকে সরে এসে আমাদের সামনে একেবারে নতুন একটি পথকে উন্মুক্ত করেছেন লেখিকা। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ঝুমলা। একটি দুর্ঘটনায় ঝুমলার বাবা ও দাদার মৃত্যু ঘটে। তখন তার বয়স নয়। উক্ত ঘটনার পর থেকেই তাদের পরিবারের সমস্ত দায়িত্বের সিংহাসনকে গ্রাস করে নেয় তার দিদির স্বামী রবিদা। মহাভারতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রতি নারীর সীমাহীন নির্ভরতার চিত্রের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটে এই গল্পে। নারী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 196 - 200
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজেই অর্থনৈতিক ও মানসিক দিক থেকে পুরুষের উপর নির্ভর থেকে নিশ্চিন্ত হতে চান। এই বাস্তবতাকে বার বার গল্পে তুলে ধরেছেন জয়া মিত্র। ঝুমলার মা তাই রবিদার অভিভাবকত্বে সহজেই স্নেহবৎসল হয়ে পরে। ঝুমলার দিদির অকাল মৃত্যুর পর তাদের সন্তান মানালি ও কুকু'র সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিল ঝুমলা। কিন্তু এরপর থেকেই ধীরে ধীরে পারিবারিক সম্পর্কের সমীকরণগুলি বদলে যেতে থাকে। পারিবারিক স্বার্থে, অভিভাবকহীনতার আশঙ্কায় ঝুমলার মা যখন ঝুমলাকে বলে— 'রবিকে বিয়ে করো তুমি'। তখন অবিশ্বাস্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝুমলা। এখানে পারিবারিক রাজনীতির এক ভয়ংকর রূপকে গল্পে তুলে ধরেন লেখিকা। যে রবিদাকে এতকাল ধরে জামাইবাবু, বাবা, দাদার জায়গায় বসিয়েছিল সে, তার সাথে বিবাহের কথা শুনে অবাক লাগে ঝুমলার। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য কুন্তী রাজনৈতিক বিবাহের মধ্যে দিয়ে দ্রৌপদীর মাধ্যমে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ককে অটুট করতে চেয়েছিলেন। উক্ত গল্পেও ঝুমলার মা, মেজদিদি ঝুমলার মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে চায়। ঝুমলার তাই মনে হয় —

"একটা মেয়ে কি একটা দড়ি নাকি যে তাকে দিয়ে সংসার বেঁধে রাখতে হবে?"[৬]

যুগ যুগ ধরে শুধুমাত্র একটি নারীর হাতেই তুলে দেওয়া হয় সংসার বেঁধে রাখার দায়িত্ব। আমৃত্যু তাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটি সংসার গড়ে ওঠে নারী, পুরুষ উভয়ের মিলিত প্রয়াসে। এই ধারণা এখনও আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত নয়। ঝুমলার এই প্রশ্ন যেন সমস্ত নারী সমাজের চেপে থাকা প্রশ্নের জ্বলন্ত বহিঃপ্রকাশ। ঝুমলার ধারণা ছিল রবিদা হয়তো কখনই এই অসম বিবাহকে মেনে নিতে পারবে না। ঠিক তখনই গল্প ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায়। দুমাস পর অফিসের কাজ থেকে বাড়ি ফিরে রবিদা যখন ঝুমলাকে বলে—

"ওদের মা হয়ে থাকতে কি সত্যি খুব আপত্তি করবে তুমি?"[৭]

এই প্রশ্নের পরে ঝুমলার আর কোন উক্তি শোনা যায় না। শুধুমাত্র তার পিছনে একটি সাদা দেওয়ালের কথা বলে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন গল্পকার। মাতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চ স্বামীকে গ্রহণ করে যে বিষ পান করেছিল, ঝুমলাও কি সেই অগ্নিকুণ্ডে আত্মবলি দেবে কিনা সেই বিষয়ে নিরুত্তর থেকেছেন লেখিকা। বর্তমান সমাজে পরিবারের কথা ভেবে ঝুমলার মতো অনেক নারীরা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় পরিবারের পছন্দ করা অচেনা, অজানা পুরুষের হাতে। ঝুমলার কাছে রবিদা অচেনা নয়, বরং একটু বেশিই চেনা। তাই তার বিশ্বাস ছিল রবিদার উপরে। কিন্তু একটি পুরুষের কাছে সম্পর্কের সমীকরণ পাল্টে ফেলতে যে বেশি সময় লাগে না, সেই সত্যই প্রকাশ পায় গল্পে। সাদা দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে গল্পে ঝুমলার অসহায় জীবনবৃত্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। হয়তো রবিদার এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই। গল্পের কোনো অংশে প্রত্যক্ষ মানসিক নির্যাতন, বলপ্রয়োগ, শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা নেই। শারীরিক বস্ত্রহরণ না হলেও মনের যে বস্ত্রহরণ সম্ভব, এই ভিন্ন দর্শনকে তুলে ধরেছেন লেখিকা এই গল্পের মধ্যে। মহাভারতের দ্রৌপদীকে যখন স্বয়ম্বর সভায় সকলে নিরীক্ষণ করছিলেন তখন কি তার মানসিক বস্ত্রহরণ ঘটেনি? একাধিক পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর যে সম্মানহানি ঘটেছিল, সেই লাঞ্ছনার পরিবর্তে অর্জুনের বীরত্বই তখন আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনা থেকে যায় নিষ্প্রভ আলোয়। জয়া মিত্র সেই নারীর মানসিক বস্ত্রহরণকে আধুনিক কালে ঝুমলার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। মহাভারতের দ্রৌপদীর এক ভিন্ন অসহায়তার দিককে তিনি একালের নারী সমাজের অসহায়তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। সমাজে হাজার হাজার নারী আছে যারা পারিবারিক কারণে বাধ্য হয়ে অসম বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরিবার বা সমাজ কখনও ভাবে না, মন থেকে মেনে না নিলে বৈবাহিক সম্পর্কের নামধারী শারীরিক সম্মন্ধ ধর্ষণের রূপ মাত্র। গল্পে কোন প্রতিবাদী স্বর শোনা না গেলেও ঝুমলার বেদনাদায়ক পরিণতি আমাদের সমাজের ঘটে চলা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। নারীদের অস্তিত্বের সংকটকে বারবার তুলেধরেন লেখিকা এই গল্পে।

নারী অস্তিত্বের সংকট মহাভারতের দ্রৌপদীর মধ্যে যেমন পাই তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা দেবী ও জয়া মিত্রের নারীদের মধ্যেও সেই সংকট বর্তমান। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের ওপর অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের রূপ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কিন্তু সেই নির্যাতনের পরিমাণ বরং আরও ভয়াবহ রূপ লাভ করছে। নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার নিয়ে আমরা সচেতন হলেও, এখনও রান্নাঘরের বাসনপত্রের আওয়াজে মায়ের অস্তিত্বকেই স্মরণ করি।

সুতরাং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতেও একাধিক নারীর মধ্যে দ্রৌপদী বর্তমান। মহাভারতের দ্রৌপদী তাই মহাশ্বেতা দেবী ও জয়া মিত্রের কলমে বিবিধ, বিচিত্র প্রশ্ন নিয়ে সার্থকভাবে শিল্পিতরূপ পেয়েছেন।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, কাশীদাসী মহাভারত, সাহিত্য সংসদ, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৪৪
২. দেবী, মহাশ্বেতা, দ্রৌপদী, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন, চতুর্থ মুদ্রন - ২০০২, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৮
৩. তদেব, পৃ. ৩৮
৪. তদেব, পৃ. ৩৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৯
৬. মিত্র, জয়া, দ্রৌপদী, গল্পসমগ্র, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০১৮, পুনশ্চ, পৃ. ৩৭
৭. তদেব, পৃ. ৩৭